প্রবন্ধ

আশায় গুড়ে বালি

পরিমল গমেজ (মাষ্টার)

পুনরুত্থান সংখ্যা-২০০৮

দেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঘেঁষা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভরপুর এক গ্রামের নাম- নিঃশ্চিন্তপুর। দুই ছেলে-শ্রান্ত- প্রান্ত, স্ত্রী শান্তনাকে নিয়ে চার সদস্যের ছোট-মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহস্বামী-নিকোলাশ, (নিকু)। পৈত্রিক সূত্রে পাওয়া চাষবাসের মোটামুটি জমা-জমি আছে, তাতেই সংসার সুন্দরভাবে চলে যায়। সমতল ভূমি হওয়াতে, ভিটার চারপাশে পরিশ্রমী শান্তনার নিরলস চেষ্টায় ও হাতের ছোঁয়ায় সারা বৎসরের বিভিন্ন প্রকারের শাক-সব্জি পাওয়া যায়। কিনতে হয় না। তাছাড়া পেঁয়াজ-মরিচ, আদা, রসুন, আলু, টমেটো, কপি এসব তো নিজ জমিতেই উৎপন্ন হয়। সারা বৎসর খেয়ে কিছু ধানও বিক্রি করতে পারে।

নিকুর বিয়ের দুই বৎসরের মধ্যেই পিতা-মাতা-স্বর্গবাসী হন! দুর্ভাগ্যই বটে, কেউ-ই নাতিদের মুখ দর্শন করে যেতে পারেনি। ৩য় বৎসরে জন্ম শ্রান্তর এবং এরও দুই বৎসর পর জন্ম প্রান্তর। দুই ভাই। দুই বৎসরের ছোট-বড়। পরিশ্রমী ও কর্মঠ নিকু সেই কাক-ডাকা ভোরে হালের গরু নিয়ে জমিতে চলে যায়। ফিরে, বেলা দুইটা-তিনটায়। স্নানাহার সেরেই আবার জমিতে। বলতে গেলে সেই রাত ছাড়া স্ত্রী- সন্তানদের আদর স্নেহ করার ফুরসৎ নেই। সারা দিনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর, রাত্রে ক্লান্তিতে দু'চোখে নেমে আসে অঘোর ঘুম। এতে কিন্তু স্ত্রী-পুত্ররা মোটেও দুঃখিত ও অভিমানি হয় না। স্ত্রী শান্তনার দুই পুত্রের স্নেহ, আদর-যত্ন করতে কার্পণ্য করে না। স্বামীর কষ্টের ও পরিশ্রমের কথা নিজে উপলব্ধি করতে পারে।

নিকু ও শান্তনার লেখা-পড়ার দৌড় বেশী নয়। নিকুকে ৮ম শ্রেণীতে থাকাকালীন সময়েই পড়াশোনা ছেড়ে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। স্কুল ছাড়ার ছয় বৎসর পর অসুস্থ পিতা-মাতার ইচ্ছা মতোই পাশের গ্রামের শান্তনাকে বিয়ে করে। শান্তনা, সবেমাত্র ৯ম শ্রেণীতে। দেখতে দুধে আলতা না হলেও সুন্দরী ও রূপসী বটে। ধীর-স্থির, শান্তশিষ্ট। প্রস্তাব আসাতে অরুন আর আপত্তি করেনি। নিকু ভদ্র, বিনম্র। কর্মঠ। কোন বাজে নেশা করে না। এমন পাত্র হাতছাড়া করলেন না। শান্তনা এত তাড়াতাড়ি বিয়েতে আপত্তি করলেও বাবা-মার আদেশকে অমান্য করতে পারলো না।

বিয়ের পর লক্ষী বৌমা পেয়ে নিকুর বাবা-মা খুব খুশী। নিজ মেয়ে না থাকলেও, বৌমাই যেন নিজ মেয়ে। শান্তনা যথাসাধ্য সেবা-যত্ন দিচ্ছে শ্বশুর-শাশুড়ীকে। দিন যায় রাত আসে। সময় বয়ে চলে। কিন্তু ঈশ্বরের ডাক বলে কথা। দুই বৎসরের মধ্যেই তারা মারা যান।

অতীত হয় দশ বৎসর। শ্রান্ত ও প্রান্ত স্কুলে যায়। পাশের গ্রামের কুসুমকলি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে ৪র্থ ও ২য় শ্রেণীতে পড়ে। নিকু পুত্রদের প্রতি যত্ন নিতে না পারলেও শান্তনা যত্নশীল। রাত্রে ছাড়াও সময় পেলেই ছেলেদের পড়াশোনা নিয়ে বসে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান দুই ছেলেই ক্লাশে ১ম স্থান পায়। স্বামী-স্ত্রী দিনে সময় না পেলেও রাত্রে যখন বিছানাতে যায়, তখন দুইজনেই, দুই ছেলেকে নিয়ে কত যে স্বপ্নের জাল বুনে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কখন যে নিদ্রাদেবীর কোলে চলে যায় এবং সকাল হয়। নিত্যদিনের রুটিন মাফিক কাজ। স্বামী-স্ত্রীর ব্যস্ততা যেন এখন আরো বেড়ে গেছে। শ্রান্ত ও প্রান্ত এখন তিন মাইল দূরবর্তী বিদ্যাসাগর হাইস্কুলে পড়ে। সামনে এসএসসি দেবে শ্রান্ত। প্রান্ত ৯ম শ্রেণীতে। সংসারের ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে। অগ্নিমূল্যের বাজার। দুই ছেলের স্কুল খরচ। জমিতেও আর আগের মতো এখন ফসল ফলে না। প্রতি বৎসর প্রাকৃতিক দুর্যোগ তো একটা না একটা আছেই। ব্যয় বাড়ছে। কিন্তু আয় তো বাড়ছে না। তাই খরচ যোগাতে গিয়ে ইতিমধ্যেই দুই বিঘা জমি বিক্রি করতে হয়েছে। প্রয়োজনে আরো জমি বিক্রি করবে, তবুও ছেলেদের শিক্ষিত করে তুলবে। ছেলেরা লেখাপড়া করে, শিক্ষিত হয়ে, ডিগ্রি নিয়ে বড় বড় চাকরী করবে। তখন আবার জমি কেনা যাবে। জমি হবে। বাড়ী-ঘরের উন্নতি হবে। ছেলেরা বিয়েথা করবে। বৌমা-রা আসবে। তাদের সেবা-যত্ন করবে। নাতি-নাতিন হবে---আরো কত কি আশার জাল বুনে, স্বামী-স্ত্রী।

সব পিতা-মাতাই তাদের ছেলে-সন্তানদের নিয়ে এমনটি আশা করেন। এতে দোষের কিছু নয়। কিন্তু সব আশাই কি বাস্তবে বাস্তবায়িত হয়? হয় না! তারই প্রমাণ নিকু-শান্তনার ক্ষেত্রে। ছেলেদের শিক্ষিত করতে গিয়ে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করেছে। জমা-জমিও বিক্রি করে এখন শূন্যের কোঠায়। বসত ভিটাটাই এখন আছে! কিন্তু এতদিন ছেলেদের উপর যে আশা করে আসছিল এখন তার সেই আশায় গুড়ে বালি! অতি পরিশ্রমে-স্বামী-স্ত্রী এখন ক্লান্ত। চুলে পাঁক ধরেছে উভয়েরই। স্বাস্থ্য ও শক্তি আগের মতো নেই। পরিশ্রম করতে পারে না।

দুই ছেলেই এখন শিক্ষিত হয়ে ভাল মাইনের চাকরী করছে। বিয়েথা করে নিজেদের স্ত্রী-সন্তান নিয়ে, শহরে চাকরী স্থলে আবাস গেড়েছে। বলতে গেলে পিতা-মাতার কথা ভুলতেই বসেছে। বিয়ে করার পর প্রথমদিকে বড়দিন-ইস্টারে, দুই ছেলেই গ্রামের বাড়ীতে বাবা-মার কাছে আসতো স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে। শান্ত থাকে ঢাকাতে। সরকারী চাকরী। প্রান্ত চট্টগ্রামে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরী করে। প্রান্তর স্ত্রীও একটি মিশনারী স্কুলে শিক্ষকতা করে। তাই অনেক সময় হয়তো গ্রামে আসে, বৃদ্ধ-অসুস্থ পিতা-মাতাকে দেখা সম্ভব হয় না। না আসুক। কিন্তু টাকা-পয়সা পাঠাতে বাধা কোথায়? বিয়ের পূর্বে দুই ভাই-ই যথেষ্ট টাকা-পয়সা, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, কাপড় লতা পিতা-মাতাকে দিতো। কিন্তু আস্তে আস্তে দুই জনেই কমিয়ে দিলো। অতঃপর পর্যায়ক্রমে, সামর্থ অনুযায়ী বড় ভাই একমাস এবং ছোট ভাই পরে মাস এভাবে তিন-চার বৎসর টাকা পাঠানোর পর এক সময় একেবারেই বন্ধ করে দিলো।

অসুস্থ ও বৃদ্ধ পিতা-মাতা পড়শীদের হাতে-পায়ে ধরে দুই ছেলেকেই পত্র লিখেছে। কিন্তু ফলাফল কিছুই হয়নি। বড় ভাই ছোট ভাইকে বলে টাকা পাঠাতে! অনুরূপ ছোট ভাইও বড়ভাইকে বলে টাকা পাঠাতে!! এভাবে দায়িত্ব এড়াতে, ঠেলাঠেলি করে টাকা পাঠানো একেবারেই বন্ধ। অথচ দুই ছেলেই স্ত্রী-সন্তান নিয়ে বেশ আরাম-আয়েশে দিন যাপন করছে। আর এঁদিকে জন্মদাতা, পিতা-মাতা গ্রামে পড়ে আছে অসুখ-বিসুখ নিয়ে, খেয়ে না খেয়ে! হায়রে স্বার্থপর সন্তান হায়রে হতভাগা পিতা-মাতা! যে পিতা-মাতা হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, নিজেদের তিল তিল রক্তের বিনিময়ে দুই ছেলেকে শিক্ষিত করে গড়েছে। ছেলেদের নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছে। কত কিছু আশা করেছে। অথচ সেই গর্ভজাত ছেলেরা-ই আজ পিতা-মাতাকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে দূরে ফেলে রেখেছে বোঝা, জঞ্জাল-আবর্জনা মনে করে! ছেলে হিসাবে কি দায়িত্ব ও কর্তব্য বোধ বলতে কিছুই নেই?

গ্রামে পড়ে থাকা অসহায় পিতা-মাতা হয়তো একদিন অজ্ঞাতসার এ পৃথিবীর আলো-বাতাস, মায়া-মমতা ছেড়ে চলে যাবে পরপারে। ছেলেরা এ দুঃসংবাদটুকুও হয়তো জানবে না! পাড়া প্রতিবেশীরা দয়া-পরবশ হয়ে মৃতের সৎকার করবে। অথচ এ গুরু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার কথা নিজ গর্ভজাত সন্তানদের। কিন্তু কোথায় সেই সন্তানেরা? আর পিতা মাতার আশা? স্বপ্ন? সে সব আশায় তো গুড়ে বালি।।